# সুন্দরবন শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প

**নমিতা সরদার**

সরবেড়িয়ায় একটা ছোটো হাসপাতাল আছে। ঐ হাসপাতালের নাম সুন্দরবন শ্রমজীবী স্বাস্থ্য প্রকল্প। হাসপাতালের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কৃষিচক্র। সর্বপ্রথম কৃষিচক্র দিয়ে শুরু হয়। তারপর হাসপাতাল। হাসপাতালের দুটো পার্ট। এক হাসপাতাল, দুই কৃষিচক্র।

রোগী দেখার জন্য হাসপাতাল / চাষবাস ও পশুপালনের জন্য কৃষিচক্র। এখানে ছাগল পালন করা হয় এবং ধান, মাছ। নানারকমের সব্জি চাষ করা হয়। রান্নার জন্য বিভিন্ন রকমের মশলা / আচার তৈরি করা হয়। হাসপাতালে ছোটো একটা দোকান আছে। দোকানে নানা রকমের খাবার থাকে। অবসর সময়ে হাসপাতালে স্বাস্থ্যকর্মীরা এই কাজগুলি করে। কারণ তাদের হাত-খরচের পয়সা নিজেরাই রোজগার করে। এই হাসপাতালকে ভিক্ষে ক'রে চালানো হয়। সম্পূর্ণ আমার আপনার দানের ওপর নির্ভরশীল। কেউ অর্থ দিয়ে, আবার কেউ শ্রম দিয়ে সাহায্য করে। হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা যেন একান্নবর্তী পরিবার। সবাই মিলেমিশে কাজ করে আনন্দ সহকারে। এমন কী নিজেরা যে খাবারটা খাবে তাদেরকে তৈরি ক'রে নিতে হয়। ছেলে, মেয়ে দুইজন ক'রে প্রতিদিন রান্না করতে হয়।

অনেক গরীব মানুষরা দূর থেকে আসে এই হাসপাতালে চিকিৎসা নেবার জন্য কারণ গরীব মানুষদের চিকিৎসা দেবার জন্য এই হাসপাতাল। পয়সার অভাবে তারা সঠিক চিকিৎসা নিতে পারে না। এমনকী তারা বাড়িতে মারা যায় এবং আমাদের প্রত্যেকের উচিত তাঁদের পাশে দাঁড়ানো। তাদের সুখ-দুঃখে সামিল হওয়া। সমাজের মানুষের প্রতি কিছু দায়-দায়িত্ব থাকে। সেগুলি পালন করা উচিত। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

মানুষ যতদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে কোনো একদিন তার চিকিৎসার প্রয়োজন হবে। বিনা চিকিৎসায় যেন কেউ মারা না যায় তার জন্য সবাইকে লড়াই করতে হবে।

আমাদের স্বাস্থ্য আমরাই গড়ব
স্বাস্থ্য পণ্য নয়।
ভিক্ষা নয়।
জন্মগত অধিকার।

---

## ২০১২ - ১৩ এক নজরে হাসপাতালের পরিসংখ্যান

জেনারেল বিভাগে রোগী দেখা হয়েছে — ২৪,১০৪ জন
স্পোলিস্ট বিভাগে রোগী দেখা হয়েছে — ৩,৭১৩ জন।
রোগী ভর্তি রেখে চিকিৎসা করা হয়েছে — ১৭১ জন।
অপারেশন হয়েছে — ১১ জন।

---

আপনার ফোনের অপেক্ষায় আছেন :
প্রিয়াঙ্কা প্রামাণিক - ৮৬০৯৬৬৫৫২০ / অলোকা সরদার - ৯০০২৫৭৫৩৮৮
চিঠি বা লেখা পাঠান এই ঠিকানায় :
সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতাল, সরবেড়িয়া - ৭৪৩৩৮৫, উত্তর ২৪ পরগণা।
অনলাইন : sekhar_university@yahoo.co.in

# বিনামূল্যে সবার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ চাই।

ডা পুণ্যব্রত গুণ

চিকিৎসার জন্য যে খরচ হয়, তার একটা ছোট অংশ যায় ডাক্তারের ফি বাবদ, তার চেয়ে একটু বড় অংশ যায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পেছনে, আর সবচেয়ে বড় খরচটা হয় ওষুধ কিনতে গিয়ে। চিকিৎসার মোট খরচের একটা বড় অংশ (৭০ থেকে ৮০%) জুড়ে থাকে ওষুধের দাম। চিকিৎসার খরচ যোগাতে দারিদ্রসীমার নীচে নেমে যায় রোগীর পরিবার।

১৯৭৭-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য'-এর লক্ষ্য স্থির করেছিল। সবার জন্য স্বাস্থ্য-এর জন্য চাই সবার জন্য ওষুধও। ৮০-র দশকের প্রথমে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রথম অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা প্রকাশ করে। ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহারের সপক্ষে দেশে দেশে প্রয়াস শুরু হয়। কোনও কোনও দেশে তা কার্যকরও হয়। যদিও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে সর্বজনীন স্বাস্থ্যের লক্ষ্য আজও অধরা রয়ে গেছে।

ভারত ১৯৭৭-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ঘোষণায় অংশীদার ছিল। কিন্তু লোক দেখানো লোক ঠকানো কিছু ঘোষণা ছাড়া কাজের কাজ কিছু এ লক্ষ্যে হয়নি বললেই চলে। ৯০-এর দশকের পর থেকে আবার শুরু হয়েছে স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে সরকারের সরে আসা এবং বেসরকারী পুঁজির রমরমা।

দ্বাদশ পরিকল্পনার আগে যোজনা কমিশন সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবার লক্ষ্যে যে উচ্চস্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল গড়েছিল তাদের সুপারিশ না মেনে সরকার দেশের মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার ভার তুলে দিতে চলেছে বীমাকোম্পানিগুলোর হাতে। ইতিমধ্যে আবার এক লোকঠকানো ঘোষণা—অত্যাবশ্যক ৩৪৮টা ওষুধের সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দিতে চলেছে সরকার।

এমন সময় দাবী উঠুক—সবার জন্য বিনামূল্যে সমস্ত জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধ চাই, সে দায়িত্ব নিতে হবে সরকারকেই।

## ওষুধ একটা পণ্য

বাজারে অন্যান্য পণ্যগুলোর ক্ষেত্রে নির্বাচন করেন ক্রেতা নিজে। যেমন মনিহারি দোকানে গিয়ে আপনি কলগেট কিনবেন, না পেপসোডেন্ট, না বাবুল—তা ওষুধও একটা পণ্য, ওষুধ-কোম্পানী ওষুধ তৈরী করে মুনাফার জন্য। কিন্তু অন্য পণ্যের সঙ্গে এ পণ্যের ফারাক হল ক্রেতা (অর্থাৎ রোগী) পণ্যটাকে নির্বাচন করেন না। রোগীর হয়ে পণ্যটাকে নির্বাচন করে দেন অন্য কেউ অর্থাৎ ডাক্তার।

**ওষুধের কাজ**

আমরা বুঝি ওষুধ বুঝি রোগ সারায়। হ্যাঁ, ওষুধ কিছু ক্ষেত্রে রোগ সারায়, যেমন যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, রক্ত আমাশা, মূত্রতন্ত্রের জীবাণু-সংক্রমণ, ইত্যাদি। কিছু ক্ষেত্রে ওষুধ রোগ সারাতে পারে না, রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, যেমন—উচ্চ-রক্তচাপ বা ডায়াবেটিসে। কখনও আবার ওষুধ দিয়ে রোগ হওয়া আটকানো যায়, যেমন—টীকাগুলো। রোগ-নির্ণয়েও ওষুধ ব্যবহার করা হয়, যেমন—এক্স-রে বা সিটি স্ক্যানে অনেক ক্ষেত্রে রঞ্জকের ব্যবহার। শরীরের স্বাভাবিক কাজকর্ম বদলাতেও ওষুধ ব্যবহার করা হয় কখনও কখনও, যেমন—জন্মনিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত ওষুধ।

**সব ওষুধ দরকারী নয়**

১৯৭৫-এ ভারতের এক সংসদীয় কমিটি বলেছিল ১১৭টা ওষুধ দিয়ে সে সময়ের ভারতের অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ মানুষের অধিকাংশ অসুখের চিকিৎসা সম্ভব। ১৯৭৭-এ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রথম যে অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকা বার করে তাতে ছিল ২০৮টা ওষুধ। অথচ সে সময়ে ভারতের ওষুধ বাজারে প্রায় ৬০হাজার ওষুধ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাম্প্রতিক অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকায় আছে ৩৭৪টা ওষুধ। ভারতের জাতীয় তালিকায় ওষুধের সংখ্যা ৩৪৮। অথচ ভারতের বাজারে ওষুধ ফর্মুলেশনের সংখ্যা ১ লাখ ছাড়িয়েছে।

এত ফর্মুলেশন তাহলে কেন?

- একই ওষুধ আলাদা আলাদা কোম্পানী বাজার-জাত করে আলাদা আলাদা নামে।
- তারপর আছে একাধিক ওষুধের নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রণ, যার অধিকাংশই অপ্রয়োজনীয়।
- এছাড়া আছে অপ্রয়োজনীয় অনেক ফর্মুলেশন, যেমন—কাফ সিরাপ, হজমী ওষুধ, টনিক...।

**দেশে প্রচুর ওষুধ তৈরী হয়, কিন্তু মানুষের জন্য ওষুধ নেই...**

আমাদের দেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ওষুধ উৎপাদক দেশগুলোর মধ্যে একটা। উৎপাদিত ওষুধের আয়তনের হিসেবে ভারত পৃথিবীতে তৃতীয়, মোট দামের হিসেবে পৃথিবীতে ১৪ নম্বর। এই ফারাকের কারণ হল আমাদের দেশে ওষুধের দাম অনেক দেশের তুলনায় কম তাই মোট আয়তন বেশী হলেও মোট দাম কম।

এত উৎপাদন সত্ত্বেও অবশ্য আমাদের দেশের অধিকাংশ নাগরিক ওষুধ কিনতে পারেন না।

**ওষুধের মূল্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে**

কোনও পণ্যের দাম ঠিক করা হয় কাঁচামালের দাম, উৎপাদন খরচ, প্যাকেজিং-এর খরচ, বিজ্ঞাপনের খরচের মোটের ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ রেখে।

স্বাধীনতার ৩২ বছর পর ১৯৭৯-এই প্রথম ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে সরকারী ভূমিকা দেখা যায়। সব ওষুধগুলোকে বিন্যস্ত করা হয় চারটে শ্রেণীতে এবং লাভের সীমা স্থির করে দেওয়া হয়।

| শ্রেণী | কি ধরনের ওষুধ? | লাভের হার |
|---|---|---|
| প্রথম | জীবনদায়ী | ৪০% |
| দ্বিতীয় | জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক | ৫৫% |
| তৃতীয় | অন্যান্য | ১০০% |
| চতুর্থ | নতুন ও বাকী সব ওষুধ | লাভের কোন উর্ধসীমা নেই |

ভাবা হয়েছিল এই শ্রেণী বিভাগের ফলে জনসাধারণ জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধ কম দামে পাবেন। আর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ওষুধ উৎপাদনে ওষুধ কোম্পানিগুলোর যে কম লাভ হবে তা তারা পুষিয়ে নেবে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ওষুধ কোম্পানীগুলো জীবনদায়ী ও অত্যাবশ্যক ওষুধ তৈরী কমিয়ে দিয়ে তৈরী করতে লাগল টনিক-কাশির সিরাপের মত অপ্রয়োজনীয় ওষুধ। যক্ষ্মা-কুষ্ঠের ওষুধের মত দরকারী ওষুধ অমিল হতে থাকল।

'৯০-এর দশকের শুরুতে শুরু হল অর্থনীতির উদারীকরণ, শিল্পে লাইসেন্সিং প্রথা অবলুপ্ত হল, ওষুধ শিল্প সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ অনুমোদিত হল। কোন ওষুধকে মূল্য নিয়ন্ত্রণের আনা হবে তা ঠিক করা হতে লাগল বাজারে ওষুধের মোট বিক্রিতে বিভিন্ন কোম্পানীগুলোর অংশের ভিত্তিতে। এই জটিল হিসেবটা না বুঝে জেনে নেওয়া যাক একটা তথ্য—বর্তমানে ৭৪টা ওষুধের কাঁচা মাল বা বাল্ক ড্রাগ এবং সেগুলো থেকে তৈরী ১৫৭৭টা ফর্মুলেশন মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায়।

সম্প্রতি উচ্চতম ন্যায়ালয়ের নির্দেশে সরকার ২০১১-র অত্যাবশ্যক ওষুধের জাতীয় তালিকায় থাকা ৩৪৮টা ওষুধকে মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় নিয়ে এসেছে। কোনও ওষুধের

যে ব্র্যান্ডগুলোর বাজারে বিক্রি, সে ওষুধের বাজারে মোট বিক্রির ১% বা তার বেশী, সেই ব্র্যান্ডগুলোর দামের গড় করে ঠিক হবে সে ওষুধের সর্বোচ্চ মূল্য। তাতে ওষুধের দাম কমার বদলে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। বেশী দামী ব্র্যান্ডগুলোর দাম কিছুটা কমবে বটে, কিন্তু কমদামী ব্র্যান্ডগুলোর দাম বেড়ে যাওয়ার আশংকা।

**যোজনা কমিশনের 'সবার জন্য স্বাস্থ্য-বিষয়ক উচ্চ-স্তরীয় বিশেষজ্ঞ দল' কি বলছে-**

দ্বাদশ পরিকল্পনার আগে সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা কিভাবে দেওয়া যায়, সে বিষয়ে সুপারিশ করতে ডা শ্রীনাথ রেড্ডি-র নেতৃত্বে এক বিশেষজ্ঞ দল গঠন করে যোজনা কমিশন। তাঁরা হিসেব করে দেখিয়েছেন স্বাস্থ্যখাতে খরচ জিডিপি-র ০.৫% বাড়ালেই সমস্ত নাগরিককে বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধগুলো দেওয়া সম্ভব।

তাঁরা সুপারিশ করেছেন—স্বাস্থ্যখাতে সরকারী খরচের অন্তত ১৫% হোক ওষুধের জন্য, অত্যাবশ্যক ওষুধের তালিকায় থাকা ওষুধগুলো সরকারকেই কিনতে হবে।... কোন রোগে কি চিকিৎসা হবে তার প্রামাণ্য চিকিৎসা বিধি (Standard Treatment Guidelines) মেনে চলতে হবে।...ভাল গুণমানের জেনেরিক ওষুধ নিশ্চিত করতে হবে।...

তাঁদের মতে ওষুধ, টীকা ও কারিগরী নাগালে আনতে

- ওষুধের যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
- জাতীয় ও রাজ্যস্তরে ওষুধ সরবরাহ কর্পোরেশন স্থাপন করতে হবে।
- ওষুধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মজবুত করার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রককে ক্ষমতা দিতে হবে।
- ফার্মাসিউটিকাল দপ্তরকে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনে দেওয়া হোক।

**জেনেরিক নামে সব ওষুধ তৈরী হোক**

ওষুধের নাম তিন রকম–রাসায়নিক নাম, চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যবহৃত জেনেরিক নাম অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অব্যবসায়িক নাম, আর একই জেনেরিক নামের ওষুধকে নানা কোম্পানী বিক্রি করে নানা ব্র্যান্ড বা বাজারী নামে।

মানুষের নাগালে ওষুধকে আনতে হলে জেনেরিক নাম ছাড়া গতি নেই। কেন না–

- কেবল জেনেরিক নামই চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইপত্রে-পড়াশুনায় ব্যবহৃত হয়।
- বাজারে একাধিক ওষুধের মিশ্রণে তৈরী প্রচুর ফর্মুলেশন পাওয়া যায়, যেগুলোর অধিকাংশই অযৌক্তিক ও অপ্রয়োজনীয়। জেনেরিক নাম ব্যবহার চালু হলে ওষুধ

কোম্পানীগুলো বেশী সংখ্যায় একক ওষুধের ফর্মুলেশন উৎপাদন করতে বাধ্য হবে।

- ওষুধের নাম দেখেই সেটা কোন ধরণের ওষুধ বোঝা সহজ হবে। একই ওষুধের নানান ব্র্যান্ড নামে মিল থাকে না, ফলে বিভ্রান্তি তৈরী হয়। এই বিভ্রান্তিও হবে না।
- দেখা যায় জেনেরিক নামের ওষুধগুলোর দাম সাধারণভাবে সেই ওষুধেরই ব্র্যান্ডগুলোর চেয়ে অনেকটা কমদামী।
- কেবল জেনেরিক নাম ব্যবহার করা হলে ডাক্তারদেরও অল্প কিছু নাম মনে রাখলেই হবে, একগাদা ব্র্যান্ড নাম মনে রাখতে হবে না।
- কেবল জেনেরিক নাম চললে ব্র্যান্ডের প্রচার-প্রসার করতে হবে না, খরচ কমবে, ওষুধের দামও কমবে।

**ওষুধ-শিল্পে পুঁজির শোষণ বন্ধ হোক**

আগে যে সংসদীয় কমিটির কথা বলেছিলাম তা হল জয় শুকলাল হাতি-র নেতৃত্বাধীন কমিটি। হাতি কমিটি ১৯৭৫-এ প্রকাশিত রিপোর্টে সুপারিশ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র যেন ওষুধ উৎপাদনে মুখ্য ভূমিকা নেয়। দেশীয় ওষুধ-কোম্পানীগুলোর বিকাশের জন্য কিছু ওষুধ-উৎপাদন কেবল দেশীয় কোম্পানীগুলোর জন্য সংরক্ষিত রাখার কথা বলা হয়। ওষুধ-শিল্পে বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর ভূমিকার নিন্দা করে কমিটি, ওষুধ-কোম্পানীগুলোতে বিদেশী বিনিয়োগের মাত্রা তৎক্ষণাৎ কমিয়ে ৪০% করা এবং তারপর কমিয়ে ২৬% করার কথা বলা হয়, এমনকি বিদেশী ওষুধ-কোম্পানীগুলোর জাতীয়করণের পক্ষে ছিল হাতি কমিটি। তা হয় নি, বরং বিদেশী বিনিয়োগ বাড়তেই থাকে। আসুন আমরা দাবী তুলি হাতি কমিটির সুপারিশগুলো কার্যকর করার।

**ওষুধের দাম প্রকৃত অর্থে নিয়ন্ত্রিত হোক**

কাঁচা মালের দাম, উৎপাদন খরচ, মোড়কের খরচ, প্রচার খরচের ওপর ১০০% লাভ রেখে ওষুধের দাম নির্ধারিত হোক—যেমনটা প্রস্তাব ছিল স্বাস্থ্য মন্ত্রকের। (আশ্চর্যের বিষয় আমাদের দেশে ওষুধশিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করে রসায়ন ও পেট্রোকেমিক্যাল মন্ত্রক, স্বাস্থ্য মন্ত্রক নয়)।

**সরকার সবার জন্য বিনামূল্যে অত্যাবশ্যক ওষুধের যোগান দিক**

যেমনটা সুপারিশ করেছেন উচ্চ-স্তরীয় বিশেষজ্ঞ-দল। সরকারতো দান-খয়রাতি করেছে না। আমাদের কাছ থেকে নেওয়া করের টাকার যথাযথ ব্যবহার করে কিভাবে এমনটা করা সম্ভব তা হিসেব করে দেখিয়াছেন তাঁরা।

# আচার

দেবব্রত হালদার

আচারটি থাকলে পাশে
মনটা না আর পড়ায় বসে।
আচারটা কি আম চালতা
তা নিয়ে কত চিন্তা।
মস্টারমশাই বলেন এই বাচ্চা
আমি বলি না না সব কাঁচ্চা।
পড়তে পড়তে ভাবি বসে
একটু আদর ক'রে হেসে।
মাস্টারমশাই যদি বলেন,
আচারগুলি সব তোমায় দিলেম।
তাতে আমি খুশি হতেম
সকল পাওয়ার থেকে।
জানিনা এই তুচ্ছ আসা
বাঁধল কেন মনে বাসা।
এই কথাটি জানার আমার
জাগলো মনে একটু আশা।
আচারটাই বা কেমন জিনিস
যদি পারতাম করতে ফিনিস।
ইচ্ছেটা মোর মনেই থাক
আচারটি তাঁর কাছেই থাক।।

# সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতাল — কিছু টুকরো ছবি

বাসুদেব ঘটক

সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতাল বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে টুকরো টুকরো নানা ছবি। ছবিগুলো আগে পরে হতে পারে। কিন্তু সব ছবি সুন্দর এবং মধুর। ১৯৯৭ পরবর্তী কোনো একটা সময়ে, আমরা তখন বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি, আলাপ হলো সরবেড়িয়া কৃষিচক্রের অরুণ সেন-এর সঙ্গে। কিছু আদিবাসী পরিবারের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে মানবাধিকার কর্মী হিসাবে কিরীটি-দা এবং আমাদের সঙ্গে পরিচয়। সেখান থেকে বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতালের ফণী-দা এবং অন্যান্যদের সঙ্গে পরিচয়। গোড়াতে কৃষিচক্রের মাটির ঘরে দু-সপ্তাহ অন্তর মেডিকেল ক্যাম্প। বেলুড় থেকে ডাক্তাররা আসতেন, সঙ্গে আমরা, মাঝে মধ্যে আমি। কিছুদিন পরেই একটা হাসপাতাল তৈরির পরিকল্পনা হলো। এখন যেখানে হাসপাতাল ভবন সেখানে হাসপাতাল হবে নাকি বড়রাস্তা ধরে কিছুটা দক্ষিণে গিয়ে একটি গ্রামে পরিত্যক্ত একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে সেখানে হবে, তাই নিয়ে আলোচনা। আলোচনা হচ্ছে পরিত্যক্ত হাসপাতাল ভবনটির দাওয়ায় বসে। আলোচনা ক'রে ফেরার পথে অরুণদা বললেন — 'এখানে হাসপাতাল করার একটা সুবিধা আছে।' আমরা জিজ্ঞাসা করলাম — কী সুবিধা? অরুণদা বললেন — এখানে প্রচুর ডাকাত আছে। আমাদের তো বিষম খাওয়ার অবস্থা। অরুণদা বুঝিয়ে বললেন — যারা ডাকাত তাদের সবার বিরুদ্ধেই তো পুলিশ কেস আছে ওরা সেটা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। আমাদের ঘাটাতে আসবে না, ফলে আমরা নির্বিঘ্নে হাসপাতাল করতে পারবো। এহেন সুবিধার কথা অরুণদার মতো মানুষই ভাবতে পারেন। সুন্দরবন শ্রমজীবীর উপর বিভিন্ন সময়ে নানা দিক থেকে নেমে আসা আক্রমণ অরুণদা তার ছোটো ছোটো সাথীদের নিয়ে যেভাবে সামলেছেন, তাতে তাঁর দুর্জয় সাহসের বহু পরিচয় আমরা পেয়েছি। সেসব কথায় আর বিস্তারিত গেলাম না।

একদিন রাত প্রায় দশটা নাগাদ ফণী-দা অর্থাৎ ভট্টাচার্য-দার ফোন — বাসু, সুন্দরবন শ্রমজীবী হাসপাতালের চাল ঝড়ে উড়ে গেছে, আমরা যাচ্ছি, তুমি সাইন্স সিটির সামনে চলে এসো। ভট্টাচার্য-দা, বাচ্চু-দা, গৌতম আর আমি শ্রমজীবীর গাড়িতে ক'রে সরবেড়িয়ার পথে চলেছি। গাড়ি চালাচ্ছেন প্রয়াগ-দা। ঘটকপুকুরের কাছে ঐ রাতে একটা চায়ের দোকান খোলা পেয়ে চা খেতে নামলাম। খাটিয়ার ওপর বসে হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়েছি — জীবনে একসাথে এত তারা আকাশে দেখিনি! আমাদের ছোটোবেলায় কলকাতার আকাশেও অনেক তারা দেখা যেত, তবে এত নয়। আজকাল আর কোনো তারাই প্রায় দেখা যায় না। চা খেয়ে আবার চলা শুরু হলো। সুন্দরবন শ্রমজীবীতে পৌঁছলাম প্রায় একটা-দেড়টা নাগাদ। ঐ রাতেও ঐরকম বিধ্বস্ত অবস্থার মধ্যেও গরম চায়ের কাপ এগিয়ে শ্রমজীবীর কর্মী বন্ধুরা অভ্যর্থনা জানালেন। ওদের ওই অভ্যর্থনার কথায় পরে আসবো, আগে ঝড়ের কথা শেষ করি। দেখলাম উত্তর দিকের ঘরটার পুরো টিনের চালটাই ঝড়ে তুলে এনে সামনের উঠোনে ফেলে দিয়েছে। তখন দোতলা বা গোলঘরটা ছিল না, এ জায়গাটা ফাঁকা ছিল। চাল তুলে ফেলে দেওয়ার প্রকৃতি দেখে আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত করলাম এটা টর্নেডো ছিল। আশপাশের টালি বা খড়ের ঘরের কিছু হয় নি। বাচ্চুদা ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, ভট্টাচার্যদা অভিজ্ঞ মানুষ, সবাই মিলে ঐ রাতেই নানা আঁক-ঝোক ক'রে ঠিক করা হলো চালটাকে কীভাবে করলে আর উড়ে যাবে না বা উড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। পরের দিনের কাজের পরিকল্পনা যখন শেষ হলো, তখন আর আগের দিন নেই, আমরা পরের দিনে পৌঁছে গেছি। পুবআকাশ লাল হয়ে গেছে। বৌদি, মামনি-রা সকালের চা

পরের পাতায় দেখুন